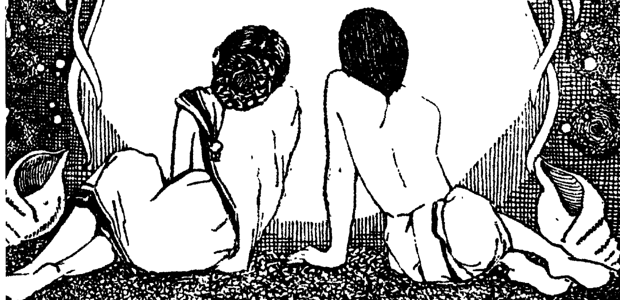
শিশুতোষ সিরিজ

সম্পাদক—

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি.এ

গল্পে

রামকৃষ্ণ



শিশির পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২৯

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲

প্রতি সংখ্যা ।৵০

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস,
২৪২-, অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।



কার্ত্তিক একেবারে অবাক হইয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নাম বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়াছ ; কিন্তু তিনি কেমন করিয়া “মাকে” পাইয়াছিলেন,—কেমন করিয়া “মাকে” দেখিয়াছিলেন সে কথা তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত জান না। এত বড় সাধুর জীবন-কথাটা সকলেরই জানা উচিত ;—তাই আজ তাঁহার জীবন কথা তোমাদের সংক্ষেপে বলিব।

হুগলি জেলায় ‘কামারপুকুর’ নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এখন এই গ্রামের অবস্থা নিতান্তই হীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক ধনী লোকের বাস ছিল,—কাজেই গ্রামখানির জাঁকজমকও বড় কম ছিল না। এই গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইলেও তাঁহার ন্যায় আচারবান ব্রাহ্মণ তখনকার দিনেও অতি অল্প ছিল। ‘রঘুবীর’ নামে তাঁহার গৃহে

একটী শালগ্রাম ছিল, তিনি তাঁহারই সেবায় দিন রাত অতিবাহিত করিতেন। ক্ষুদিরামের পত্নীর নাম ছিল চন্দ্রমণি দেবী। চন্দ্রমণির প্রকৃতিটা এমনই সরল ছিল যে তাঁহার আপন পর ভেদ ছিল না। কাহার দুঃখ দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়াছে,—ক্ষুধার্ত্ত প্রতিবেশীকে নিজের অন্নগুলি প্রদান করিয়া নিজে প্রফুল্ল মনে উপবাসে দিন কাটাইয়াছেন।

হুগলি জেলায় এই কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রমণি দেবীর গর্ভে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রমণি দেবীর পূর্ব্বে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। ক্ষুদিরাম তাঁহার এই কনিষ্ঠ পুত্রটীর নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর। কখন ও কেমন করিয়া তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ হইল তাহা তোমাদের পরে বলিব।

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ দুই সহোদরের নাম ছিল,—রামকুমার ও রামেশ্বর ও ভগ্নির নাম ছিল কাত্যায়নী। রামকৃষ্ণের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের পর সংসারের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র রামকুমার ও রামেশ্বরের উপর পড়িল। দুই ভাই তখন সংসার চালাইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু উপার্জ্জন তেমন না হওয়ায় সংসারে বড়ই টানাটানি হইতে লাগিল। সংসার ঘাড়ে পড়িবার পর রামকুমারের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, কেমন করিয়া সংসারে আবার সচ্ছলতা আনিবেন রামকুমারের তখন তাহাই একমাত্র চিন্তা হইল। তিনি অনেক চিন্তার পর কলিকাতায় গিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন এবং একটা শুভদিন দেখিয়া জননীর পদধুলি লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রামকুমার ঝামা-পুকুরে একটি টোল খুলিলেন। তখন রামকৃষ্ণের বয়স চোদ্দ বৎসর। রামকুমার কলিকাতা আসিবার পর তাহাদের বাটীর গৃহ দেবতা রঘুবীরের পূজা রামকৃষ্ণই করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ সে সময়ে তাঁহাদের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে ছিলেন বটে, কিন্তু লেখা পড়ায় তাঁহার আদৌ ঝোঁক্ ছিল না। তাঁহার কণ্ঠটী ছিল অতি সুমিষ্ট। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি গান গাহিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাহার মুখে কোন গান একবার শুনিলেই তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত এবং সেই সকল গান অতি সুন্দর ভঙ্গিমার সহিত গাহিতেন। কামারপুকুর গ্রামের সকলেই রামকৃষ্ণকে বড় ভালবাসিত। স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাঁহাকে আদর করিয়া নিজের নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠের গান শুনিত। রামকৃষ্ণেরও কোন বাছ বিচার ছিল না, আদর করিয়া তাঁহাকে যে ডাকিত তাহারই বাড়ী

গিয়া তাঁহার মধুর গানে তাহাদের একেবারে মোহিত করিয়া দিতেন।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন সতের বৎসর তখন রামকুমার ভ্রাতার গ্রামে লেখাপড়া কিছুই হইতেছে না দেখিয়া রামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। রামকুমার চেষ্টার কোনই ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, বাল্যকাল হইতেই রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বিষয় ভিন্ন অপর কোন বিষয়েই মন বসিত না।

রামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে কলিকাতা জানবাজার নিবাসী রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া এক ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন ও তথায় কালী ও রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা দিবার জন্য যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সমবেত

হইয়া বলিলেন, "রাণী কৈবর্ত্ত,—কাজেই কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা করিতে পারে না।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই মত শুনিয়া রাণী সত্যই বড় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই শাস্ত্রে ইহার কোন ব্যবস্থা আছে, ভাবিয়া রাসমণি দেশ বিদেশে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই কথা রামকুমারের কানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখনই ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইলেন, যে রাণী গুরুকে তাঁহার ঠাকুর-বাড়ী দান করুন, তাহা হইলে কালী ও রাধা-গোবিন্দের পূজার কোন বাধাই থাকিবে না। রামকুমারের এই ব্যবস্থা পাইয়া রাণী রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল না। অবিলম্বেই রাম-কুমারের ব্যবস্থা অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি দিন স্থির হইল, এবং রাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে রামকুমারকেই সেই কাজের ভার লইতে হইল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সালে মহা ধূমধামের সহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন,—কিন্তু কৈবর্ত্তের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি সে দিন বাজারে গিয়া মুড়ি মুড়কি কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াই রামকুমার অব্যাহতি পাইলেন না,—রাণীর জেদাজেদিতে পড়িয়া বিগ্রহের পূজার ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইল। রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম থাকিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু রামকুমার যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইহা অন্যায় নহে তখন আর তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। সেই হইতে রামকৃষ্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। রাণী তাঁহার জামাতা মথুর মোহন বিশ্বাসের উপর ঠাকুর বাড়ীর তত্ত্বাবধানের

ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের সরল মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুর সেবার কোন একটা কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ প্রথমে ঠাকুর সেবার কোন কাজেই হাত দিতেন না। শেষে ভ্রাতার অনুরোধে ও মথুরবাবুর জেদাজেদিতে বাধ্য হইয়া ঠাকুরের বেশকারীর পদ গ্রহণ করিলেন। বেশকারীর পদগ্রহণ করিবার পর হইতেই রামকৃষ্ণের প্রাণের ভিতর কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল। মাকে বেশ পরাইতে পরাইতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতে লাগিলেন, মায়ের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য দিন দিন তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় সামান্য কয়েক দিনের পীড়ায় রামকুমার দেহত্যাগ করিলে,—রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের উপরেই কালী পূজার ভার পড়িল। কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই রামকৃষ্ণের

কেমন যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ঠাকুর বাড়ীর যেখানে সেখানে ধূলায় পড়িয়া 'মা-মা' বলিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূজার সময় পূজা করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি নৈবেদ্য কাক বিড়ালকে খাওইয়া দেন, আর কেবলই 'মা-মা' করিয়া কাঁদিতে থাকেন। ঠাকুর বাড়ীর সকলে রামকৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণ বদ্ধ পাগল হইয়াছেন। এ সংবাদ মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিলম্বেই পাইলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন,—রামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহে, তাঁহার পাগলামীর ভিতর এমন একটি জিনিষ আছে যাহা সাধারণ পাগলের ভিতর নাই। তিনি যে একজন মহাপুরুষ,—তিনি যে সত্য সত্যই মায়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, এটুকু বুঝিতেও রাণী রাসমণির বিলম্ব হইল না, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল।

দিন দিন রামকৃষ্ণের অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহার দ্বারা মায়ের পূজা হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে যে দেখিত সেই ভাবিত তিনি একেবারে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমণি দেবী পুত্রের এই অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, —মথুরবাবুও রামকৃষ্ণের মাতার ইচ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রামকৃষ্ণকে কামারপুকুরে পাঠাইয়া দিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া রামকৃষ্ণ কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। চন্দ্রমণি দেবী আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের একটী বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কামারপুকুরের নিকটে জয়রামবাটী গ্রামে রামকৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইল। ঐ গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা ছিল, তাহারই সহিত রামকৃষ্ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আবার তাঁহার ভাবান্তর হইল, আবার তিনি 'মা-মা' বলিয়া পাগল হইলেন। এই সময় একজন সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন, ইনি তন্ত্র শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মহাপুরুষ বলিয়া চিনি-লেন এবং তাঁহাকে তন্ত্র প্রণালীতে সাধনা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সন্ন্যাসিনীর নিকট রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তোতাপুরী স্বামী পরমহংস পরিব্রাজক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই বেদান্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারেন। তোতা-পুরীর নিকটেই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তিনিই তাঁহার নাম দেন রামকৃষ্ণ। এইভাবে বার বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ভারতবর্ষে যত প্রকার ধর্ম্ম মত

প্রচলিত আছে, তাহার সবগুলিতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে সাধনা আরম্ভ করিতেন একেবারে তখন সেই সাধনায় বিভোর হইয়া পড়িতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব যে একজন মহাপুরুষ, অতি শীঘ্রই এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার হিতোপদেশ শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে জড় হইতে লাগিল। ভাবের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে তাঁহার সমাধি হইত! ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহা সমাধিতে নিমগ্ন হন। সে সমাধি আর তাঁহার ভাঙ্গে নাই। মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহার শত সহস্র ভক্ত শিষ্য তাঁহার হিতোপদেশগুলি পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। উপদেশচ্ছলে তিনি যে সকল ভাবের গল্প তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি গল্প তোমাদের বলিব।

নারদের অহঙ্কার।

নারদ ছিলেন একজন ভারিদরের ঋষি। দিন রাত খালি তিনি হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেন। একবার নারদের মনে মনে ভারি অহঙ্কার হইল যে তাঁহার মত হরিভক্ত বুঝি আর কেহ কোথাও নাই। ভগবান সবই জানিতে পারেন,—তাঁহার কাছে তো আর কিছুই অজানা নাই। কাজেই নারদের এই অহঙ্কারের কথাটুকুও তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নারদ, পৃথিবীতে আমার একজন বড় ভক্ত আছে,—তাঁহার চাইতে বড় ভক্ত আমার আর কেহ নাই। তোমার একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসা উচিত।"

ভগবান হরির এই কথা শুনিয়া নারদের মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। ভগবান একি বলিতে-ছেন? আমি দিনরাত কেবল হরিগুণ গান করিয়া

বেড়াই, আমার চেয়ে আর বড় ভক্ত কে থাকিতে পারে ? লোকটাকে দেখিয়া আসা উচিত।

নারদ ভগবানের কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না, সেই লোকটাকে দেখিবার জন্য তখনই যাত্রা করিলেন। অনেক গ্রাম সহর পার হইয়া শেষে নারদ সেই ভক্তের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারদ তথায় আসিয়া দেখি-লেন, ভগবান যাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, সে একজন চাষা। সকালে একবার শ্রীহরি বলিয়া হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া যায়। তাহার পর সারাদিন ক্ষেতের কাজ করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া, রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আবার একবার শ্রীহরি বলিয়া শুইয়া পড়ে। নারদ তো একেবারে অবাক্। আমি দিন রাত হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেছি আমি হইলাম না ভগবানের যথার্থ ভক্ত,—আর এই চাষা কিনা তাঁহার যথার্থ ভক্ত। ভগবানের উপর নারদের বেশ একটু রাগ হইল। নারদ বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া



নারদ মহা সতর্কতার সহিত কৈলাশে যাত্রা করিল।

আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ তোমার কেমন বিচার হইল? আমি দিন রাত তোমার নাম লইয়া বেড়াই, আমি তোমার যথার্থ ভক্ত হইলাম না,—আর সেই চাষাটা, যে দিন রাতের ভিতর কেবলমাত্র দুইবার তোমার নাম স্মরণ করে, সেই হইল কিনা তোমার যথার্থ ভক্ত?"

ভগবান হরি নারদের এ কথার কোন উত্তর দিলেন না,—তিনি এক ভাঁড় তৈল আনিয়া নারদের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই তৈলের ভাঁড়টা তুমি কৈলাশে দিয়া আইস। কিন্তু সাবধান, দেখিও যেন তৈল মাটীতে না পড়িয়া যায়।"

নারদ ভগবান হরির নিকট হইতে তৈলের ভাঁড়টী লইলেন। ভাঁড়টী একেবারে তৈলে পরিপূর্ণ ছিল। হাত একটু নড়িলেই তৈল মাটীতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই নারদকে মহা সতর্কতার সহিত তৈলের ভাঁড়টী লইয়া কৈলাশে যাত্রা করিতে হইল। পর দিন নারদ যখন তৈলের ভাঁড়টা কৈলাশে দিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন

ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে নারদ, কাল তুমি কতবার আমার নাম স্মরণ করিয়াছিলে ?"

ভগবানের কথার উত্তরে নারদ মহা বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"নাও ঠাকুর, কাল কি আর তোমার নাম স্মরণ করিবার সময় পাইয়াছি ! তুমি যে তৈলের ভাঁড় দিয়াছিলে, তাই সাম্‌লাতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।"

নারদের কথা শুনিয়া ভগবান মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,—"নারদ, তুমি একটা তৈলের ভাঁড় সাম্‌লাইতেই এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলে যে সমস্ত দিন রাতের ভিতর একটী বারের জন্যও নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবার অবসর পাইলে না ! আর সেই চাষা দিন রাত সংসারের শত যন্ত্রণার ভিতর থাকিয়াও অন্ততঃ দুইবার আমার নাম স্মরণ করিতে একদিনের জন্যও ভুল করে না,—তবেই বলো দেখি, তাহার মত ভক্ত আমার আর কে আছে ?"

ভগবান শ্রীহরির কথা শুনিয়া লজ্জায় নারদ আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অহঙ্কারটুকুও চিরজীবনের মত চলিয়া গেল।

কে কতবার ভগবানকে ডাকে তাহাতে ভক্তির পরিচয় হয় না। ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই বাধা বিঘ্নের মধ্যে, সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যেও যিনি ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান না তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

বামুনের গো-হত্যা।

এক দেশে এক বামুন ছিলেন। তাঁর বাগানে বড় [illegible]োঁক্। বামুন নিজের হাতে এমন একটি সুন্দর বাগান করিয়াছিলেন যে তেমন বাগান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কোন ভাল ফলের গাছ ছিল না যা বামুন তাঁহার বাগানে না পুতিয়াছিলেন।

একদিন একটা গরু সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া বামুনের একটী বড় সখের কলমের আম গাছ একেবারে মুড়াইয়া খাইয়া ফেলিল। বামুন তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপর একটী গাছের গুঁড়ি স্বহস্তেই পরিষ্কার করিতেছিলেন। গরুটা তাঁহার সেই বড় সাধের কলমের চারাটা খাইয়া ফেলায় বামুন আর রাগ কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না,—সম্মুখেই একটা শাবল পড়িয়াছিল, তিনি সেইটী তুলিয়া সেই গরুটার দিকে ছুটিলেন এবং এরূপ সজোরে সেই শাবলটার

দ্বারা গরুটাকে আঘাত করিলেন যে গরুটাকে আর এক পাও নড়িতে হইল না, এক আঘাতে সেইখানে পড়িয়াই গরুটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া গেল।

বামুন গরু মারিয়াছে এ-কথাটা শীঘ্রই গ্রামের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একেই তো গরু-মারা মহা পাপ,—তাহার উপর বামুন হইয়া গরু-মারা —সে পাপের ত আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। গ্রামের লোক সকলে মিলিয়া বামুনকে এক-ঘরে করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। বামুন এই মহা বিপদে পড়িয়া অন্য উপায় না দেখিয়া বলিল,

"গরু আমি মারিয়াছি কে বলিল,—গরু ত আমি মারি নাই ;—আমার এই হাত গরু মারিয়াছে। আর হাতেরও আমি অপরাধ দিতে পারি না কারণ হাতের কি ক্ষমতা ? এই হাত-খানি নাড়াইতেছেন, ফিরাইতেছেন যিনি, যাঁহার ক্ষমতায় এই হাত গরু মারিয়াছে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ত সে অপরাধ তাঁহার।

অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য দায়ী ভগবান। আমিও নই, আমার হাতও নহে।”

বামুন ভগবানের উপরে সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইলেন। ভগবান এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন বুড়ো বামুনের বেশ ধরিয়া সেই বামুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। বামুন তখন বাগানের ভিতরেই পায়চারী করিতেছিলেন, ভগবান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাপু ও বাগানটী কার?”

বামুন তখনই উত্তর দিল,—“আমার।”

ভগবান বলিলেন,—“বাঃ, তোমার বাগনটি ত বেশ সুন্দর! কি সুন্দর সারবন্দি করিয়া গাছগুলি রোপণ করা হইয়াছে। তোমার মালি দেখিতেছি বড় কাজের লোক।”

বামুন উত্তর দিল,—“মালি টালি আমার কেহ নাই। আমি নিজেই এসব গাছ পুঁতিয়াছি”

ভগবান বলিলেন,-“তাই নাকি! তাহা হইলে

তুমি একজন কাজের লোক। এ রাস্তাটীও বড় চমৎকার হইয়াছে,—এ রাস্তাটীও কি বাপু, তুমিই করিয়াছ?”

ভগবানের কথায় বামুনের ভিতরটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“এ বাগানে যা কিছু দেখিতেছেন এ-সবই আমার তৈয়ারী। এ রাস্তাও আমি নিজে করিয়াছি।

বামুনের কথায় ভগবান মনে মনে হাসিতে-ছিলেন, বামুনের কথাটা শেষ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, “ঠাকুর, সবই যখন তুমি করিয়াছ তখন গরু মারিবার জন্যই কি ভগবান বেচারী দায়ী।”

বামুনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

ভাল কাজগুলির বেলায় যখন নিজের বলিয়া বাহাদুরী করিতে ছাড় না, তখন অন্যায় কাজ করিলেই বা ভগবান দায়ী হইবেন কেন?

সাপ ও সন্ন্যাসী।

(১)

এম গ্রামের ধারে এক মাঠে এক প্রকাণ্ড সাপ একটা গর্ত্তের ভিতর বাসা করিয়াছিল। সাপটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি ভয়ঙ্কর। সাপটার ভয়ে গ্রামের লোক সেই মাঠের ত্রিসীমানায় যাইতে সাহস করিত না। যদি কোন লোক না জানিয়া সেই মাঠের নিকট যাইয়া পড়িত, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা ছিল না, সাপটা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইত।

সেই মাঠের পাশের মাঠে রাখাল ছেলেরা গরু চরাইত, আর যদি কাহাকেও সেই মাঠের দিকে যাইতে দেখিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাপের কথা বলিয়া সেদিকে যাইতে নিষেধ করিত। একদিন রাখালেরা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিল একজন সন্ন্যাসী সেই

মাঠের দিকে যাইতেছেন। অমনি একজন ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিল,

"ঠাকুর, ও দিকে যাইবেন না, ও দিকে যাইবেন না। ঐ মাঠে একটা প্রকাণ্ড সাপ আছে। সাপটা বড় ভয়ঙ্কর—মানুষের শব্দ পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া কামড়ায়।"

রাখাল বালকের কথায় সন্ন্যাসী একটু স্তব্ধ হইলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৎস! আমি সন্ন্যাসী, আমি সাপের ভয় রাখি না। সাপের এমন শক্তি নাই যে সন্ন্যাসীকে কামড়াইতে পারে।

সন্ন্যাসী আর বিশেষ কোন কথা কহিলেন না, একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর আবার সেই মাঠের দিকেই অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী তাহাদের নিষেধ না মানিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া রাখাল ছেলেদের আর গ্রামে ফেরা হইল না, সাপটা কি করে দেখিবার জন্য গরুর পাল লইয়া তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী মাঠে যাইবামাত্র সাপটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া

সন্ন্যাসীকে কামড়াইবার জন্য ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে ফিরিবামাত্র তাহার গর্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল, সে আর ফণা তুলিতে পারিল না, মড়ার মত সন্ন্যাসীর পায়ের সম্মুখে পড়িয়া রহিল। তখন সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে সাপটাকে বলিলেন,—

"কি হে বন্ধু, আমাকে কি কামড়াইতে চাও।"

সাপটার তখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সে আর লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না,—যেমন ফণা নীচু করিয়াছিল তেমনই ফণা নীচু করিয়া রহিল। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—

"বন্ধু, তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন কাহাকেও কামড়াইবে না তাহা হইলে আমি আবার তোমাকে তোমার পূর্ব্ব শক্তি ফিরাইয়া দিতে পারি।"

সাপ মশাই তখন করেন কি,—অন্য উপায় ত আর নাই। বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে সে আর ভবিষ্যতে কাহাকেও কামড়াইবে না! সন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্ব

শক্তি তখন ফিরাইয়া দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর সাপ মহাশয়ও সুড় সুড় করিয়া নিজের গর্ত্তের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—কাজেই সাপ আর কেমন করিয়া মানুষকে কামড়াইবে। সে অতি ভদ্রভাবে জীবন কাটাইতে লাগিল। সাপটার এই ভাব দেখিয়া রাখাল ছেলেরা ভাবিল, সাপটার নিশ্চয়ই বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সাপটার আর কোন শক্তি নাই। তাহার পর হইতে তাহারা সাপটাকে দেখিতে পাইলেই ঢিল মারিতে আরম্ভ করে কিন্তু তবুও সাপটাকে ফণা পর্য্যন্ত তুলিতে না দেখিয়া তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা একদিন সাপটার লেজ ধরিয়া এমনি ঘুরান ঘুরাইল যে সাপটার সর্ব্বাঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একশা হইয়া গেল। কিন্তু তবুও সে কাহাকেও কিছু বলিল না, কোনক্রমে প্রাণটুকু লইয়া গর্ত্তে গিয়া প্রবেশ করিল।

সেই সময় সেই সন্ন্যাসী আবার একদিন সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তিনি সাপটির অবস্থা দেখিয়া বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —“বন্ধু,তোমার এমন অস্থি চর্ম্ম সার অবস্থা কেমন করিয়া হইল ? তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে ?

সাপ মাথা নাড়িয়া বলিল,—“আমার অসুখ বিসুখ কিছুই করে নাই ! আপনার আদেশ মত আমি আর মানুষকে কামড়াই না, - তাই মানুষে আমার এই হাল করিয়াছে। সে দিন তাহারা আমার লেজ ধরিয়া এমন ঘোরান ঘুরাইয়াছে যে আমার সর্ব্বাঙ্গের হাড় চুরমার হইয়া গিয়াছে।

সাপের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী প্রাণে বড় বেদনা পাইলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ভাই, আমি তোমাকে কামড়াইতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ফোঁস করিতে তো নিষেধ করি নাই। তুমি ফোঁস কর নাই কেন ? তাহা হইলে তো তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। লোকের অনিষ্ট করিও না,

কিন্তু লোক তোমারও যাহাতে অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার জন্য তোমারও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পরদিন রাখালের ছেলেরা সেই মাঠে আসিবা মাত্র সাপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহারা ভাবিল সাপটার বুঝি আবার বিষ দাঁত গজাইয়াছে। তখন যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। সেই হইতেই সাপটা আবার বেশ নিশ্চিন্তে বাস করিতে লাগিল।

ঘণ্টাকর্ণ।

এক দেশে এক লোক ছিল সে দিন রাত কেবল শিবেরই আরাধনা করিত। তাহার মত শিব ভক্ত লোক সচরাচর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। সে যথার্থ শিবকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিত, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? তাহার চরিত্রে একটা মহৎ দোষ ছিল যে সে অপর কোন দেবতাকেই মানিত না। ভক্তি করা তো দূরের কথা বরং তাহাদের মনে মনে ঘৃণা করিত। লোকটীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া এক-দিন শিব তাহাকে দেখা দিলেন, বলিলেন, "দেখ বাপু, সব দেবতাই এক, কাজেই একজনকে ঘৃণা করিলে সব দেবতাকেই ঘৃণা করা হয়। তুমি যত-দিন পর্য্যন্ত না অপরাপর দেবতাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিবে ততদিন পর্য্যন্ত তুমি কিছুতেই আমাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।"

শিব লোকটিকে এই কয়টি কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। কিন্তু তবুও লোকটির চৈতন্য হইল না। সে পূর্ব্বেও যেমন অপর দেবতাদিগকে ঘৃণা করিত এখনও তেমনি ঘৃণা করিতে লাগিল। শিবের কথাগুলির কোন ফল ত হইল-ই না বরং উল্টা ফল হইল। পূর্ব্বে সে প্রকাশ্যভাবে কোন দেবতারই নিন্দা করিত না কিন্তু শিবের আগমনের পর হইতে সে প্রকাশ্যভাবেই তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে শিব আবার একদিন হরিহর মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহাকে দেখা দিলেন। লোকটা হরের পার্শ্বে বসিয়া হরির মূর্ত্তি দেখিয়া ভিতরে মহা জ্বলিয়া গেল। সে হরির মূর্ত্তির দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না,—কেবল হরেরই পূজা করিল। লোকটার এই ব্যবহারে শিব মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনই সেই লোকটার সম্মুখ হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, ভবি ভুলিবার নহে,সে তবুও অপর অপর দেবতাদিগকে

ভক্তির চক্ষে দেখিত না, —তাঁহাদের যেমন অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিল তেমনই অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

লোকটার এই গোঁড়ামীর কথা শীঘ্রই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশের ছেলেরা তাহাকে দেখিলেই 'শ্রীবিষ্ণু' 'শ্রীবিষ্ণু' চীৎকার করিয়া লোকটাকে খেপাইতে আরম্ভ করিল। লোকটা এমনই শিবের গোড়া হইয়া পড়িয়াছিল যে ছেলেদের 'শ্রীবিষ্ণু' চীৎকার তাহার একেবারে অসহ্য হইল। বিষ্ণুর নামটা সে কাণে তুলিতেও নারাজ। ছেলেদের 'শ্রীবিষ্ণু' চীৎকারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সে এক মতলব আঁটিল। তাহার দুই কাণে দুটা বড় বড় ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিল। যখনই ছেলের দল 'শ্রীবিষ্ণু' করিয়া চীৎকার করিত অমনি সে সবলে তাহার মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিত। অমনি ঘণ্টা ঢনাঢন্ শব্দে বাজিয়া উঠিত আর 'শ্রীবিষ্ণু'র নামটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। লোকে



অমনি ঘণ্টা চনাচন্ শব্দে বাজিয়া

তাহার পর হইতে তাহাকে **ঘণ্টাকর্ণ** বলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার গোঁড়ামীর জন্য সে আজও আমাদের চক্ষে এমনি ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছে, যে আজও আমাদের দেশের ছেলেরা ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে এই ঘণ্টাকর্ণের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। কোন বিষয়েই গোঁড়ামী করা কাহারও উচিত নয়।

ব্রাহ্মণ ও ভাগবত।

এক রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ আমি ভাগবতে সুপণ্ডিত। আমি আপনাকে কিছু ভাগবতের কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বেশ ভাল রকমই জানিতেন, যে যিনি ভাগবতে সুপণ্ডিত হইবেন, যিনি ভাগবত বুঝিবেন, তাঁহার সমস্ত প্রাণ ভগবানকে চিনিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—তিনি সামান্য ধন সম্মানের জনা রাজসভায় কখনই আসিবেন না। ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে তাই রাজা বলিলেন,

"ব্রাহ্মণ, ভাগবত এখন আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। বাড়ী যান,—বাড়ী গিয়া অগ্রে ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করুন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি ভাগবত যখন আপনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবেন তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার মুখে ভাগবত শুনিব।"

রাজার এই উত্তরে ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন, রাজাটা কি নির্ব্বোধ, আমি আজ এত বৎসর ধরিয়া ভাগবত পড়িলাম, আর রাজা কিনা অনায়াসে বলিলেন,—আমার এখন ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন ও অতি মনোযোগের সহিত আর একবার ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন এবং যথা সময়ে আবার যাইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে আবার রাজসভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজা আবার সেই একই উত্তর দিলেন,—"ব্রাহ্মণ, আপনার এখনও ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই।"

রাজার আচরণে ব্রাহ্মণ এবার বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাজা তাঁহার সহিত এরূপ আচরণ করিতেছেন কেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন না কোন অর্থ আছেই। ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিয়া গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভাগবত লইয়া বসিলেন এবং

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। এইভাবে একমনে কিছু দিন ভাগবত পাঠ করিতে করিতেই ভাগবতের গুপ্ততত্ত্ব সকল তাঁহার প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধন, মান, কামনা, বাসনা সবই ধুইয়া মুছিয়া একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। রাজার নিকট যাইবার কথা আর একবারের জন্যও তাঁহার প্রাণের ভিতর উদয় হইল না। তখন হইতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া দিনরাত কেবল তাঁহারই আরাধনা করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না দেখিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন,—এক্ষণে ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসা উচিত। রাজা স্বয়ং একদিন ব্রাহ্মণের কুটিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্বর্গের জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, এতদিনে আপনার ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার শিষ্য করুন।"

ব্রাহ্মণের তখন ধ্যান ভাঙ্গিল, কিন্তু রাজার কথায় তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির উপর তখন আর তাঁহার লোভ ছিল না।

উপর উপর পাঠ করিলে কেবল পাঠ করাই হয় তাহাতে মানুষ পণ্ডিত হইতে পারে না। পণ্ডিত হইতে হইলে মন প্রাণ এক করিয়া পাঠ করা আবশ্যক।

চারি অন্ধ।

এক গ্রামে চারিটী অন্ধ বাস করিত। সেই গ্রামের জমিদার একটী হাতী ক্রয় করিয়া আনিলেন। গ্রামের অনেকেই হাতী দেখে নাই,—জমিদারের হাতী আসিবামাত্র দলে দলে লোক হাতী দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিল। গ্রামের জমিদার যে একটী হাতী আনিয়াছেন, অন্ধ চারি জনও সে কথা শুনিল। হাতীর মত জানোয়ার পৃথিবীতে আর নাই,—অন্ধ চারি জনেরও হাতী দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল। তাহারা চারিজনে হাতী দেখিবার জন্য বাহির হইল। কিন্তু অন্ধ তাহারা, কেমন করিয়া হাতী দেখিবে? হাতের দ্বারা স্পর্শ করিয়া যতটুকু বোঝা সম্ভব তাহারা কেবল ততটুকুই বুঝিল। বাড়ী আসিয়া যে হাতীর পায়ে হাত দিয়াছিল সে বলিল,- "হাতীটা ঠিক একটা থামের মত।"

দ্বিতীয় অন্ধ হাতীর শুঁড়টা স্পর্শ করিয়াছিল,

সে বলিল,—"হাতী থামের মত কেন হইবে,—ঠিক একটা গদার মত।"

তৃতীয় অন্ধ হাতীর পেটে হাত দিয়াছিল, সে বলিল,—"হাতীটা থামের মতও নহে, গদার মতও নহে,—হাতীটা একটা মস্ত থলির মত।"

চতুর্থ অন্ধ হাতীর কেবল কাণ দুইটী স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, সে বলিল,—"আমার তো মনে হয় হাতীটা একটা মস্ত বড় পাখার মত।"

এই লইয়া চারি অন্ধ মহা তর্ক জুড়িয়া দিল,—কেহই কাহার কথা মানিতে চাহে না, যে যেটুকু হাতীর স্পর্শ করিয়াছে সে সেইরূপই হাতীটার পরিচয় দিতে লাগিল। সেই সময় একটী ভদ্রলোক সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। চারিটী অন্ধ পরস্পর কি জন্য এত তর্ক করিতেছে সেটুকু শুনিবার জন্য তিনি তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের তর্কের বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমরা কিসের জন্য এত তর্ক করিতেছ?"

ভদ্র লোকটীর প্রশ্নের উত্তরে চারিটী অন্ধ

আগাগোড়া সমস্ত কথা বলিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমরা আপনাকেই মধ্যস্থ মানিতেছি—বলুন তো মহাশয় হাতীটা কিরূপ দেখিতে ?"

ভদ্রলোক বলিলেন,—"বাপু, তোমরা শুধু শুধুই তর্ক করিতেছ। হাতী কিরূপ তোমরা কেহই জান না। মোটের উপর হাতী থামের মতও নহে, থলির মতও নহে, গদার মতও নহে, পাখার মতও নহে। তবে হাতীর পাগুলা থামের মত, শুঁড়টা গদার মত,—পেটটা থলির মত আর কাণ দুইটা পাখার মত। এই সবগুলো এক করিলে যেমন দেখিতে হয় হাতীও ঠিক তেমনি দেখিতে।"

পৃথিবীতে মানুষও ঠিক এই ভাবে ভগবান সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত তর্ক করে। যে যে ভাবে ভগবানকে কল্পনা করে, ভগবান সেই রূপই—সে বলিতে চায়।

কার্ত্তিক।

একে কার্ত্তিক ভগবতীর ছোট ছেলে,—তাহার উপর তিনি ছিলেন আবার দেব সেনাপতি। কাজেই স্বর্গে কার্ত্তিকের পসার খুব বেশীই ছিল। একদিন কার্ত্তিক দেব সভা হইতে বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন, পথে আসিতে আসিতে দেখিলেন, একটা বিড়াল তাঁহার সম্মুখ দিয়া রাস্তাটা পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কার্ত্তিকের বয়স তখন নিতান্তই অল্প,—ছেলেমানুষী তখনও তাঁহার যায় নাই। বিড়ালটাকে দেখিয়া কার্ত্তিকের কেমন মনে হইল,বিড়ালটাকে রাস্তা পার হইয়া যাইতে দিবেন না। যেমন তাঁহার এই কথাটা মনে হইল অমনি তিনি বল্লম দিয়া বিড়ালটাকে একটা খোঁচা মারিলেন,—বিড়ালটা মিউ মিউ করিতে করিতে যে দিক দিয়া আসিয়াছিল আবার সেই দিকেই ফিরিয়া গেল। কার্ত্তিক যেমন প্রফুল্লমনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন তেমনি প্রফুল্লমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কার্ত্তিক

কার্ত্তিক বাড়ী আসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন,—তাঁহার মায়ের মুখের খানিকটা যায়গা বিশ্রী রকম ছড়িয়া গিয়াছে। ভগবতীর মুখের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ মা, তোমার মুখের উপরটা অমন ভাবে কেমন করিয়া ছড়িয়া গেল?"

ভগবতী মৃদুস্বরে বলিলেন,—"বাবা, এ তোমারই বল্লমের আঘাত।"

মায়ের কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের আর আশ্চর্য্যের সীমা পরিসীমা রহিল না, তিনি আবার বলিলেন,—"সে কি মা! আমি তোমায় কখন আঘাত করিলাম?"

ভগবতী বলিলেন,—"বাবা, তুমি আমায় আঘাত কর নাই সত্য, কিন্তু তুমি আজ বাড়ী ফিরিবার সময় একটা বিড়ালকে তোমার বল্লমের দ্বারা খোঁচা দিয়াছিলে, না?

বিড়ালের কথাটা কার্ত্তিক ভুলিয়াই গিয়া-

ছিলেন, মায়ের কথায় সে কথাটা আবার মনে পড়িল, তিনি লজ্জিতভাবে বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, আমি আসিরার সময় একটা বিড়ালকে বল্লমের খোঁচা মারিয়াছিলাম বটে ;—তাহাতে তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি ?—তাহাতে তোমার মুখ এমনভাবে ছড়িয়া যাইবার কারণ কি ?"

ভগবতী স্নেহভরে বলিলেন,—"বাবা, সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। আমা হইতেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি। তুমি যাহাকেই আঘাত কর, সে আঘাত আমাকেই লাগিবে।"

মায়ের এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের জ্ঞান হইল, সেই হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও কাহাকে অনর্থক আঘাত করিবেন না।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

আমি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, আমি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করি এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অর্জ্জুনের মনে বেশ একটু অহঙ্কার হইল। ভগবান অন্তর্য্যামী,—তিনি তখনই সেই কথাটা জানিতে পারিলেন। অহঙ্কারের চেয়ে বড় দোষ মানুষের আর কিছুই নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "চল অর্জ্জুন, একটু বেড়াইয়া আসি।"

দুই সখায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই অর্জ্জুন দেখিলেন একটা ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস খাইতেছে অথচ তাহার কোমরে একখানা তরওয়াল ঝুলিতেছে। ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস কেন খাইতেছে তাহা বুঝিতে অর্জ্জুনের বিলম্ব হইল না। অর্জ্জুন বুঝিলেন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' গ্রহণ করি-



শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আসিয়া দেখিল ব্রাহ্মণের কোমরে তরওয়াল বাঁধা রহিয়াছে।

য়াছে। তাজা ঘাসেরও প্রাণ আছে, তাই সে শুক্‌নো ঘাস খাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের কোমরে তরওয়াল বাঁধা রহিয়াছে কেন এটুকু আর বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখা, এ কি রকম! পাছে প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয় সেইজন্য এই ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস খাইতেছে, অথচ ইহার কোমরে তরওয়াল ঝুলিতেছে কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথায় বলিলেন. "তাইতো সখা, চল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেই সব জানিতে পারা যাইবে!"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, পাছে প্রাণীর প্রাণে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় তুমি শুক্‌নো ঘাস খাইতেছ, অথচ তোমার কামরে তরওয়াল ঝুলিতেছে কেন?"

ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের দিকে চাহিল, তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমি চারিটী লোককে সাজা

দিব বলিয়া এই তরওয়াল রাখিয়াছি। যদি কখনও তাহাদের দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহাদের আর কিছুতেই রক্ষা নাই।"

অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের কথায় অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে চারিজন লোক কে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "প্রথম হইতেছে বদমাইস্ নারদ!"

"তাঁহার অপরাধ?"

ব্রাহ্মণ রাগে চোখ দুইটা কট্‌মট্ করিয়া বলিলেন, "তাঁর অপরাধ? তাঁর অপরাধ ভয়ঙ্কর। সে আমার প্রভুর নিকট দিনরাত গান গাহিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেছে। তাহার জ্বালায় ভগবান এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারেন না।"

"দ্বিতীয় লোকটী কে?"

"দ্রৌপদী!"

"তার অপরাধ?"

"তার অপরাধও বড় কম নয়। দেখ, তাহার আস্পর্দ্ধা। প্রভু আমার আহারের জন্য যাইতেছিলেন সেই সময়ে কিনা সে তাঁহাকে ডাকিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য খাওয়া ফেলিয়া তখনই তাঁহাকে কাম্যবনে ছুটিতে হইল। তাই কি শুধু—তারপর সে কিনা আমার প্রভুকে তাহার উচ্ছিষ্ট খাবার খাইতে দিল। এত বড় অপরাধের পর কি আমি তাহাকে সাজা না দিয়া স্থির থাকিতে পারি।"

"তৃতীয়টী কে?"

"তৃতীয়টী হইতেছে,— প্রহ্লাদ। সে ছোঁড়ারও আস্পর্দ্ধা বড় কম নয়। বালক তৈলের কড়ার ভিতর যাইতে, হাতীর পায়ের নীচে পড়িতে, এমন কি থামের ভিতর ঢুকিতে তাঁহাকে অনায়াসে বলিল,—একটু বাধিল না।"

অর্জ্জুন অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,— "শেষটী কে?"

"ব্রাহ্মণ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছিল ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"নচ্ছার অর্জ্জুন"

"তার অপরাধ ?"

"তাহার অপরাধ সব চেয়ে বেশী। সে কিনা আমার ঠাকুরকে রথের সারথি করিল।"

ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখিয়া আপনা হইতে অর্জ্জুনের মাথা নত হইয়া পড়িল। সেইদিন হইতে তাঁহার সমস্ত অহঙ্কার ধুইয়া মুছিয়া একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল।

অহঙ্কার বড় পাপ।